নৈতিক শিক্ষায় আখ্যানমঞ্জরী: প্রাসঙ্গিকতা

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের কাজ শুরু করার পাশাপাশি শিক্ষা সংস্কারের উপরও জোর দিয়েছিলেন। শিল্পনির্মাণ প্রচেষ্টার সাথে সাথে ছোটোদের মানুষ করে গড়ে তোলার অন্যতম কারিগর তিনি। আজকের বালক ভবিষ্যতের নাগরিক, আর সূনাগরিক সমাজের সম্পদ দেশের সম্পদ। সৌজন্য সংব্যবহার, ন্যায়-নীতি-ধর্মবোধ, প্রেম-ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, পরোপকার ও সত্যনিষ্ঠা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অপরিহার্য। কিন্তু আজ চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন সন্ত্যতার সংকট ঘনিয়ে আনছে তখন মনে হয় আমাদের প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী*-এর আখ্যানগুলোর পর্যালোচনা। শিশুপাঠ্য হলেও সুখপাঠ্য আখ্যানগুলো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে বিবেক, মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। এখানে বিদ্যাসাগরের সেই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা।

সূচক শব্দ: মূল্যবোধ, সূনাগরিক, শিশুপাঠ্য, শিষ্টাচার, চরিত্রগঠন, অবক্ষয়, মানবসমাজ।

লেখক

ড. উজ্জ্বল শীল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিক্রমজিৎ গোস্বামী মেমোরিয়াল কলেজ, জয়পুর,
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ujshil@gmail.com

মূলপ্রবন্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর(১৮২০-১৮৯১) একজন সাহিত্যিক, সমাজ-শিক্ষা সংস্কারক, মানবদরদী শিল্পী। সারাজীবন তিনি সমাজ ও শিক্ষার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম ও সংগ্রাম করে গেছেন। উদারতা ও মানুষের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসায় গড়ে ওঠা ব্যক্তিত্ব। যুক্তি দর্শন হৃদয়বেগের ভিত্তিতে পরোপকারের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর সৃষ্টি সম্ভার সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলা গদ্যশিল্প নির্মাণে ও সমাজের মানুষকে নতুন চিন্তা-চেতনার আলোকে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচনা ও বিতর্কমূলক মৌলিক গ্রন্থ, স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনী বিষয়ক গ্রন্থ, ব্যঙ্গ রচনা, ব্যাকরণ রচনা প্রভৃতির পাশাপাশি অনেক অনুবাদমূলক গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেখানে তাঁর নিজস্বতার প্রভাব বিদ্যমান। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাঙ্করে লেখা থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তিনি দয়ারসাগর। মানবের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। তিনি চেয়েছেন আদর্শ চরিত্র গঠন, মানবপ্রেমের বন্ধনে পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যান্য ব্যক্তিচার ও শঠতাকে দূরে ঠেলে সহজ সরল সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে চলার পথে মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দিতে। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি কেবল লেখাপড়া শেখানোর কৌশল হিসেবে এই গ্রন্থগুলি রচনা করেননি। শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগী করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। আজকে একবিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী যখন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, শোষণ-শাসনের নতুন অস্ত্রে মানুষ পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত, নিজ স্বার্থ চরিতার্থতায় নৈতিকতা বিবেক দায়িত্ব কর্তব্য প্রেমের মূল্যকে বিসর্জন দিতে চলেছে— সেদিকে দৃষ্টি দিতেই আমার মনে হল বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী*(১৮৬৩)র আখ্যানগুলোর কথা। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সামাজিক জীবনে *আখ্যানমঞ্জরী*-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাটা মন্দ হবে না।

সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কারে অত্যন্ত মনোযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন মানুষের সু-অভ্যাস ও চরিত্রগঠন করতে হলে শিক্ষাই তার একমাত্র উপায়। আর তা ব্যতিরেকে একটি দেশ বা জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। শিশুর ভাষাজ্ঞান শিক্ষা একদিকে যেমন তাকে নানা বিষয়ের বই পড়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করবে তেমনি নিজেকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারবে। আর নীতিজ্ঞান তাকে সৎ পথে চলার আদর্শ যোগাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি *আখ্যানমঞ্জরী* রচনা করেন। *আখ্যানমঞ্জরী* ঈশপের ফেবলস্ অবলম্বনে অনুবাদ হলেও এর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমরা চিনতে পারি। এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ- ১. *আখ্যানমঞ্জরী*-প্রথম ভাগ, তেইশটি আখ্যান ২. *আখ্যানমঞ্জরী*-দ্বিতীয় ভাগ, পঁচিশটি আখ্যান ৩. *আখ্যানমঞ্জরী*-তৃতীয় ভাগ, একুশটি আখ্যান। আখ্যানগুলো শিশুপাঠ্য কেন্দ্রিক হলেও বৃহত্তর তাৎপর্যে মানবসমাজের কল্যাণেই নিবেদিত। আখ্যায়িকাগুলো ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-প্রেম, নীতি-নৈতিকতা, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিষ্ঠা ও ধর্মবোধ প্রভৃতি নানা দিক থেকে মানুষকে একধরনের শিক্ষা দিয়ে তাদের চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে উপদেশের প্রাধান্য বেশি আর তৃতীয় ভাগে গল্পরসের বেশি প্রাধান্য আখ্যায়িকাগুলোকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। মানুষের চরিত্রের নানাদিক অনায়াসেই উঠে এসেছে। আখ্যানগুলোর মধ্যে পরোপকার কৃতজ্ঞতা ত্যাগের অসাধারণ শিল্পোৎকর্ষ পাওয়া যাবে। *আখ্যানমঞ্জরী*-এর প্রথম ভাগ-এর প্রথম আখ্যান *প্রত্নপকার*-এর কথাই উল্লেখ করি। একজন অস্বাভাবিক হাত পা ভেঙে কাদায় পড়ে থাকা বালককে উদ্ধার করে। অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে একজন বৃদ্ধকে বালকের শুশ্রূষার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয় অর্থও দিয়ে দেয়। বৃদ্ধার সেবায় বালকটি সবল ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। সে সূত্রধরের কাজে নিযুক্ত হয়। কিছুদিন অতিক্রান্তের পর কাজে ব্যস্ততার মধ্যেও বালকটি দেখতে পায় কাছাকাছি একটি সেতুর উপর থেকে ভীতি ও চঞ্চলতাবশত একটি ঘোড়া তার প্রভুকে

নিয়ে জলে বাঁপ দেয়। অনেক লোকের সমাগমেও কোনো ব্যক্তি সাঁতারে অনভিজ্ঞ অশ্বারোহীকে বাঁচাতে সাহস পায়নি। কিন্তু সেই বালকটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অশ্বারোহীকে বাঁচায়। অশ্বারোহী প্রাণদাঁতাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা সম্মান জানিয়ে পুরস্কার প্রদানে উদ্যত হলে বালকটি আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাবশত পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করে এবং অশ্বারোহীকে পিতাসম মর্যাদা দিয়ে বলে—“মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছুকাল পূর্বে আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কৰ্দমে পতিত ছিলাম; আপনি সে সময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সৰ্বক্ষণ জাগরুক রহিয়াছে।... আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম; আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।”^১। বুঝতে বাকি থাকে না যে অন্যের প্রাণরক্ষা করা যেমন ধর্ম তেমনই সেই উপকারীর প্রাণরক্ষা ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করাও নৈতিক দায়িত্ব। এই তো মানবিকতার লক্ষণ। পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান আখ্যানে পেসাক নামের দয়াশীল মহিলা সান্তেনিয়ন নামে একজন ব্যক্তিকে বিপদের দিনে আশ্রয় দেন। সান্তেনিয়নের বিপদে পেসাকের বিপদ হতে পারে ভেবে সান্তেনিয়ন আশ্রয় নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু পেসাকের কাছে পরের জন্য আত্মবিসর্জনই শ্রেয় মনে হয়— “আপনকার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে, পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আমি আপন আবাসে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না।... বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণধারণের কোন প্রয়োজন দেখিতেছিন না।”^২। অন্যের বিপদে নিঃশর্ত আত্মত্যাগ দয়াশীলতার অনেক আখ্যান আছে। রাজকীয় বদান্যতা আখ্যানে রাজা গরিব বালকের পরিবারকে যেভাবে বাঁচায় সেখানে রাজার কোনো অহংকার আভিজাত্য নেই। রাজা হয়েও তিনি দরিদ্র মানুষের ব্যথা-বেদনার সাথে একাত্ম। এছাড়া দয়া ও দানশীলতা, যথার্থ পরোপকারিতা, দয়ালুতা ও পরোপকারিতা দয়া ও সদ্বিবেচনা, দয়া সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা, যথার্থ বদান্যতা, দয়াশীলতা, দয়া ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা, দয়ালুতা ন্যায়পরতা প্রভৃতি অনেক আখ্যান আছে।

ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেম-ভালোবাসা কেন্দ্রিক বহু আখ্যানে মানবচরিত্রের মহৎ নিদর্শন চিত্রিত হয়েছে। মাতৃভক্তি আখ্যানে বারো বছরের বালক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত মাকে বাঁচাতে মায়ের সেবা করার সাথে সাথে কারখানাতেও কাজ করে। পিতৃভক্তিতে পিতা বেকনর জাহাজ থেকে সমুদ্রে পতিত এক শিশুকন্যাকে বাঁচান। কিন্তু নিজে হাওরের মুখে পড়লে তার সন্তানই নিজের জীবন সংশয় করে তাকে বাঁচায়। অন্য একটি পিতৃভক্তি আখ্যানে দুর্ভিক্ষের সময় বাবা-মাকে বাঁচাতে তাদের মেয়েকে নিজের দাঁত বিক্রি করতে যেতে দেখি। পিতৃবৎসলতা আখ্যানে পেনশনহীন পিতা খাদ্যসংকটে ভোগে। আর ছেলে সেজন্য সৈনিক স্কুলে প্রাণধারণের চেয়ে অতিরিক্ত খাবার খেতে অস্বীকার করে। কারণ বাবা অভুক্ত থাকলে ছেলে খায় কি করে! মাতৃবৎসলতা আখ্যানটিতে মাতৃভক্তির চিত্র যেন নির্বাক করে দেয়। একজন নারী প্রাণদণ্ডের আদেশে কারাগারে অবরুদ্ধ। কারাগারে অনাহারে রেখে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। এই বন্দিনীর মেয়ে প্রতিদিন কারাগারে আসে মাকে দেখতে। জেলকর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মায়ের জন্য কোনো খাবার মেয়েকে নিয়ে যেতে দেয় না। তাহলে তো মায়ের অনাহারে বাঁচার কথা নয়। কিন্তু মা তো দিব্যি বেঁচে আছে! কী করে সম্ভব? কারাধ্যক্ষ অনুসন্ধান করে জানলেন—“কারাধ্যক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা, জননীকে স্তন্যপান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এতাদৃশী ঐকান্তিকতা দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন।”^৩। মেয়ের মাতৃভক্তি ও বুদ্ধিকৌশলে মুগ্ধ জেলকর্তৃপক্ষ মায়ের অপরাধ মার্জনা করলেন। ব্রাত্মস্নেহ আখ্যানে সহোদরের প্রেম অনবদ্য রূপ পেয়েছে। সুইজারল্যান্ডে প্রচণ্ড শীতের প্রাদুর্ভাবে পথ ভুলে দুই ভাই জঙ্গলে প্রবেশ করে। সন্ধ্যা হলেও ঘরে ফেরার রাস্তা না পাওয়ায় ভীতসন্ত্রস্ত দুই বালক প্রচণ্ড শীতে জঙ্গলেই রাত কাটায়। বড়ো

ভাই— “কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল,ভাই আর কাঁদিও না; তোমার কোনও ভয় নাই আইস,এখানে শয়ন কর।”^{৪৪} শুধু ভাই নয়— “কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল,দাদা,বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত; এক্ষণে কি উপায়ে তাহার শীত নিবারণ হয়,অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল।...সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তার শীত নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।”^{৪৫} বাবার প্রতি ভক্তি ও ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা একসাথে দেখা যায় *পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য* আখ্যানে। বাবা বিষয়সম্পত্তি বড়ো ছেলেকে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু বড়ো ছেলে বাবার জীবিতকালে চরিত্রগত দোষ সংশোধন না করায় ছোটো ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে পরলোকগমন করেন। পরবর্তীকালে বড়ো ছেলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চরিত্রগত দোষ থেকে মুক্ত হয়ে ভালো মানুষ হয়। ছোটো ছেলে ভাবছে দাদা যদি আগেই ভুল বুঝে ভালো মানুষ হতো তাহলে বাবার মনোবাসনা পূর্ণ হতো আর সম্পত্তিও দাদার হতো। সেদিক থেকে এই সম্পত্তি ভালো মানুষ দাদার প্রাপ্য। ছোটো ভাই বাবার অতৃপ্ত ইচ্ছা পূরণ এবং দাদাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে অনুর্তানের আয়োজন করে। আত্মীয়দের সামনে দাদাকে সম্পত্তি দানপত্র করে দেয়। আখ্যানের শেষ পঙ্ক্তি—“সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ,এরূপ পিতৃভক্ত,এরূপ ভ্রাতৃবাৎসল্য নিতান্ত বিরল।”^{৪৬} এরকম বিরল প্রেম-ভালোবাসার চিত্র ভিন্নভাবে পাব *সৌভ্রাত, অকৃত্রিম প্রেম, পিতৃভক্তি ও প্রতিপরায়ণা, অপত্যস্নেহের একশেষ* প্রভৃতি আখ্যানে।

মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠনে নির্লোভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত লোভ পতনের মূল কারণ। জীবনে নির্লোভ মন,মানবীয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সত্যদৃষ্টিকে অবলম্বন করা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ভূমি এই সত্য দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাঁর অনুবাদমূলক গ্রন্থগুলি এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমাজজীবনকে প্রত্যক্ষ করে সত্য উপলক্ষের মাধ্যমে জীবনের সৌন্দর্যকে অনুভব করেছেন। বিদ্যাসাগরের সাধনা সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— “ তাঁর কর্মই তাঁর বাণী।.....সত্য বাস্তব,এবং প্রত্যক্ষ সমাজজীবনের বিচিত্র সম্পর্কজাত। এবং তাকে উপলব্ধি করতে হবে এই সম্পর্কের মধ্যেই। নিরন্তর প্রবাহিত-হতে-থাকা সমাজজীবন তাঁর সম্মুখে একের পর এক যে সমস্যা তুলে ধরেছে,তাকে আত্মগত করা,সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন এবং সমাধানের পথে সেই কালের মানুষের জীবনকে সৃষ্টির সৌন্দর্যে মণ্ডিত করা,সত্যের স্বরূপ তার মধ্যেই নিহিত। এই সত্যের ধ্যানই বিদ্যাসাগরের ধ্যান।”^{৪৭}-ভাই তো তিনি এরকম আখ্যানগুলো অনুবাদে সার্থকতা পেয়েছেন। *লোভসংবরণ* আখ্যানে এক গরিব বালক বাড়ির মালিকের সোনার ঘড়ি চুরি করার সুযোগ পেয়েও চুরি করেনি। সে লোভকে সংবরণ করেছিল। বাড়ির মালিক নির্লোভ গরিব বালকটির সংচরিত্রে অবিচল থাকার পুরস্কার হিসাবে তার যাবতীয় দায়িত্ব ও বিদ্যাশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। *ধর্মভীরুতা* আখ্যানে একজন বিধবা স্ত্রীর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ চূড়ান্ত শিল্পরূপ পায়। অনেক কষ্টে গরিব বিধবা ছয় সন্তান প্রতিপালন করে। ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে পড়ার জায়গায় একটি মহামূল্যবান বাস্তু পেলেও আত্মসাৎ না করে অনেক কষ্টে রাজার কাছে জমা দেয়। কারণ সে গরিব হলেও পরের সম্পত্তি ভোগ করবে না। তবে পরিশ্রমের জন্য কিছু পুরস্কার নিতে চেয়েছে। সততা ও ধর্মবোধই বিধবার দুঃখ মোচনের কারণ। রাজার কথায়—“তুমি দুঃখিনী বটে,তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্মভীরু লোক কখনও দেখি নাই। তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্নসমূহ হস্তে পাইয়া ধর্মভয়ে লোভসংবরণ করিয়াছ,তজ্জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দূরবস্থা মোচন হইল।....আমি তোমার ও তোমার সন্তানগণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।”^{৪৮}-*ধর্মপরায়ণতা* আখ্যানেও একজন বৃদ্ধা নির্লোভ মন ও ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছে। গরিব বৃদ্ধাকে একজন প্রতিবেশী তার সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে যান এবং আর ফিরে আসেননি। বৃদ্ধা কিন্তু সেই সম্পত্তি ভোগ করেনি। সে দীর্ঘ অনুসন্ধান করেছে প্রতিবেশীর উত্তরাধিকারীর। বহু কষ্টে ও পরিশ্রমে একজন উত্তরাধিকারীর দেখা পেয়ে তাকেই সমস্ত

সম্পত্তির দায়িত্ব সপে মুক্তি পেয়েছে। *ন্যায়পরায়ণতা* আখ্যানে লেনার্ড নামে এক বালক গরিব পরিবারের সন্তান। কাজের সন্ধানে বাবার বন্ধুর কাছে গেলে তিনি সন্তান স্নেহে তাকে বিশ্বাস করেন। ন্যায়বোধে বিশ্বাসী বালক টাকা মোহর বহুমূল্যবান রত্নের প্রতি কোনো লোলুপ দৃষ্টি প্রদর্শন করেনি। সততা ও ন্যায়বোধের পুরস্কার স্বরূপ বাবার বন্ধুর সন্তানসম সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। *নিঃস্পৃহতা* আখ্যানে আলেকজাণ্ডার হিপষ্টিয়নকে নির্দেশ দেন বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে সাইডমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে। হিপষ্টিয়ন দুই সহোদরকে নির্বাচন করলেও তারা রাজকূলে জন্মাননি বলেই রাজী হননি। অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হয়ে সুযোগের সংব্যবহার করেননি। কিন্তু তারা চান লোভী ও স্বার্থপর কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হোক। নির্বাচনের ক্ষমতা এই দুই ভাইয়ের উপর ন্যাস্ত হলে তারা এন্ডোলোনিমস্ এর নাম প্রস্তাব করলেন— “আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তি লাভের অভিলাষী নহি, এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এন্ডোলোনিমস্ নামে এক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন; আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র।”^{৯৮} এন্ডোলোনিমস্ লোভী বা স্বার্থপর নন। সত্যধর্ম পথে সিংহাসনে অধিষ্ঠিতের যোগ্য। *ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা* আখ্যানে দেখা যায় নির্লোভ ন্যায়পরায়ণ ধর্মপ্রাণ মানুষ জীবন যত কষ্টে কাটাক না কেন একদিন সে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছায়। মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৭৮৪ সালে ইবেশাম উপত্যকার প্রাচীন ধর্মপ্রাণ পাদরির মৃত্যু হল। তার সহকারী দেবালয়ে সামান্য বেতনে কাজ করে কষ্টে দিয়াপন করত। সে মৃত পাদরির একটি পুরাতন আলমারি কিনেছিল। সেটার ভেতরে চারিশত গিনি ছিল। সহকারী ব্যক্তিটি গরিব হলেও অসং বা লোভী ছিল না। তার মানসিকতার প্রকাশ— “তিনি সাতিশয় ধর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অসং উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি; সুতরাং আলমারিতে আমার স্ব স্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারিশত গিনিতে কোনও মতে, আমার স্ব স্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না।... পরস্বহরণ, লোকতঃ ও ধর্মতঃ সর্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম।”^{৯৯} এই সহকারী মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীকে চারশত গিনি ফেরত দিয়ে দেয়। এই ন্যায়ধর্ম আদর্শবোধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানসজাত।

নীতিবোধ সৌজন্য শিষ্টাচার উদার মানবিকতার প্রকাশ *আখ্যানমঞ্জরী*-এর অনেক আখ্যানেই আছে। *অদ্ভুত আতিথেয়তা* নামে দুটি আখ্যান আছে। কাহিনি প্রায় একইরকম। তৃতীয় ভাগ-এর আখ্যানটি উল্লেখ করছি। এখানে আরবজাতির সাথে মুরদের সংগ্রামে মুর সেনাপতির হাতে আরব সেনাপতির পিতার মৃত্যু ঘটে। আরব সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করেছিল আগামীকাল সূর্যোদয় হলেই পিতৃহত্যাকারীকে খুঁজে হত্যা করবে। অন্যদিকে মুর সেনাপতি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে আরব সেনাপতির বাড়িতেই আশ্রয়প্রার্থী। তখনও অবশ্য আরব সেনাপতি জানত না এই ব্যক্তি পিতৃহত্যাকারী। যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধাসহযোগে মুর সেনাপতির আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি হয়নি। পরে দুজনের মধ্যে কথপোকথনে আরব সেনাপতি চিনতে পারে মুর সেনাপতিই তার পিতাকে হত্যা করেছে। বিমর্ষ হলেও সুযোগ পেলেও মুর সেনাপতিকে তখন হত্যা করতে পারেনি। কারণ পরম শত্রু হলেও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রয়দাতা তার অনিষ্ট করতে পারে না। মুর সেনাপতিকে তখন হত্যা করলে নীতিহীন অন্যায় অধার্মিক কাজ হতো। তাই আরব সেনাপতি সূর্যোদয়ের আগেই মুর সেনাপতিকে নিরাপদে চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে— “আপনি সন্ত্রস্ত প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয়ধর্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না।”^{১০০} *বর্বর জাতির সৌজন্য* আখ্যানে দেখিয়েছেন ইউরোপীয় ব্যক্তি সভ্যজাতির অহংকারে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর আমেরিকার আদিম অধিবাসীকে একটু জল পর্যন্ত দেয়নি। ঘৃণা করেছে। কিন্তু ওই ইউরোপীয় ব্যক্তি বিপদে পড়লে আমেরিকার অধিবাসী ঘৃণা না করে আশ্রয় দিয়েছে, সেবা করেছে। এখানেই হৃদয়ের মহত্তা। সৌজন্য ও সদব্যবহারই সভ্যজাতি

অসভ্যজাতি চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি। এরকম অনেক আখ্যান আছে। *আখ্যানমঞ্জরী*-এর তৃতীয় ভাগে *যতো ধর্মস্তত জয়ঃ, মহানুভবতা, দয়ালুতা ও ন্যায়পরায়ণতা* প্রভৃতি আখ্যানগুলি যেমন ন্যায় ধর্মবোধ বিবেক সত্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি কাহিনি সংঘটনে, চরিত্র বিশ্লেষণে গল্পরসকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। সহজ সরল গদ্যশৈলীতে মানবজীবনে চলার পথে জনশিক্ষার প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন বিবেকবান দরদীশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জনশিক্ষা তখনই সার্থক হবে যদি শিক্ষার্থী নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, বিবেকবান হয়ে ওঠে। আজকের দিনে শিশুদের নৈতিক শিক্ষার পাঠদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার পাঠদান বিভিন্ন গল্প-কাহিনি ছড়া-কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে শিশুদের বিবেকবোধে জাগ্রত করার প্রয়াস যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে তাতে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা আরও ভাস্বর হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। একটি একটি করে পরিবার একত্র সংগঠিত হয়ে দেশ বা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গৌরব নির্ধারিত হয়। আর তার প্রধান অঙ্গ বিবেকবান শিশু যা একদিন হয়ে ওঠে দেশের সূনাগরিক। বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা, আন্দোলন ও কার্যকলাপে শিশুদের নৈতিকবোধে শিক্ষাদান ছিল এক মহৎ উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র:

১. ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ-চৈত্র, ১৪১৬, পৃষ্ঠা-৪২৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪৮
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩০
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩০
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৪২১
৭. অরবিন্দ, পোদ্দার, ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, গ্রন্থবিতান, কলকাতা-১২মার্চ, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬৩
৮. ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ-চৈত্র, ১৪১৬, পৃষ্ঠা-৪৩৩
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৫
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮০
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. পোদ্দার, অরবিন্দ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পথিক, গ্রন্থবিতান, মার্চ ১৯৭৩, কলকাতা- ৭০০০১২
২. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সোম পাবলিশিং, প্রথম সোম পাবলিশিং সংস্করণ: জুলাই ২০২১, কলকাতা- ৭০০০১২
৩. সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ, বাঙালীজীবনে বিদ্যাসাগর, সাহিত্যপ্রীতি, ১৯৬৩, কলকাতা- ৭০০০০৯
৪. বসু, স্বপন, সমকালে বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩, কলকাতা- ৭০০০০৯
৫. বিদ্যারত্ন, শঙ্কুমিত্র, বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ক্রমনিরূপ, চিরায়ত প্রকাশন, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৪, কলকাতা- ৭০০০৭৩